بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৪ঠা মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত কিছুকাল যাবৎ কতিপয় জুমুআর খুতবায় আমি বিভিন্ন কাহিনী বা ঘটনা অথবা শিক্ষণীয় গল্প উপস্থাপন করে আসছি যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। আজও যখন আমি এমন সব ঘটনা বর্ণনার জন্য নির্বাচন করছিলাম তখন আমার মনে হলো, পাক-ভারতের এসব পুরোনো কাহিনী, গল্প বা ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, এসব গল্প বা ঘটনা আজ পর্যন্ত চলমান থাকাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই। যদি জামাতের বই-পুস্তকে এগুলো সংরক্ষিত না হতো তাহলে অনেক আগেই তা কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত আর আধুনিক যুগে কেউ এসব ঘটনা সম্পর্কে জানতোই না। আজ বেশ কয়েকটি ভাষায় এগুলোর অনুবাদ হয়। যাহোক আমি যেমনটি বলেছি, আজও সেই ধারাবাহিকতায় আমি কিছু গল্প বা কাহিনী উপস্থাপন করবো। এগুলো নিছক কাহিনী নয় বরং কিছু বাস্তব ঘটনাও বটে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসবের সূত্র ধরে কিছু নসীহত করেছেন। কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা বাহ্যত চুটকী বা কৌতুক কিন্তু তাহতেও তিনি (আ.) কতিপয় সংশোধনের দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

এমনই একটি কৌতুক এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন মালিনীর দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন, তার দু'জন কন্যা ছিল। একজনের বিয়ে হয়েছিল কুমারদের ঘরে আর দ্বিতীয় জনের বিয়ে হয় মালির ঘরে। যখনই আকাশ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেই সেই মহিলা উন্মাদের মতো ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করত। মানুষ জিজ্ঞেস করতো, হয়েছে কী? সে বলতো, আমার এক মেয়ে আর নেই। কেন? সে বলতো, বৃষ্টি হলে কুমারদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা; তাদের ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে মালীদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে তাদের ফসল বা সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হবে না। যাহোক বৃষ্টি হলে কুমারদের তৈরি বাসন-কোসন বা হাঁড়ি-পাতিল নষ্ট হবে আর বৃষ্টি না হলে সবজি উৎপাদনকারীদের সবজি ইত্যাদির ক্ষতি হবে। বাহ্যতঃ এটি সামান্য একটি কথা কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই প্রেক্ষাপটে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাহলো, কাদিয়ানে দু'ব্যক্তির মাঝে পরস্পর মতভেদ হয় বা কোন ঝগড়া হয়। বন্ধুরা তাদেরকে বুঝিয়ে মিমাংসার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের উভয়েই বলে, আমরা ইংরেজী আদালতের শরণাপন্ন হবো এবং তাদের দ্বারাই সিদ্ধান্ত করাবো, আর সরকারী বিচার বিভাগে

একে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করে। যখনই মামলার শুনানী হতো তারা স্বয়ং বা তাদের কোন প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে দোয়ার অনুরোধ জানাতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, উভয়েই আমার মুরীদ আর তাদের উভয়ের সাথেই আমার সম্পর্ক আছে, কার পক্ষে জয়ের আর কার বিরুদ্ধে পরাজয়ের দোয়া করবো? আমি তো এই দোয়া করি যে, তাদের মাঝে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে-ই যেন জয়যুক্ত হয়। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এখনও আহমদীরা যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগে বা আদালতে মামলা করে তখন একই সাথে তারা আমার কাছেও দোয়ার জন্যও লিখে পাঠায়। এভাবে দোয়ার জন্য বলা তেমনই যেমন বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। হয় কুমারদের ঘরে যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে অথবা মালীর ঘরে যার বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে। একজন তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কেউ যেন আবার একথা মনে না করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেহেতু মামলা-মোকদ্দমার চল ছিল তাই আজও এমনটি করলে কোন অসুবিধা নেই বা এটি বৈধ। এটি অবশ্যই বৈধ, বিচারের জন্য মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে কিন্তু যদি সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয় আর নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই আচরণ পছন্দ করেন নি। তাই নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন ভালো নয়। অতএব হঠকারিতাও বর্জন করা উচিত আর দোয়ার অনুরোধ করে ইমামকেও সমস্যা বা কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়া উচিত নয়। উভয় পক্ষই যদি আহমদী হয় তাহলে কার জন্য দোয়া করবেন আর কার জন্য করবেন না। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেই দোয়া করেছিলেন আমিও সেই দোয়াই করি, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! ন্যায্য অধিকার যার তুমি তাকেই দান কর।

আল্লাহ্ তা'লা একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর তা হলো, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়া বা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী ব্যতিরেকে বাকি সব ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা উচিত, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত। যখন ধর্মীয় বিষয় আসে বা ধর্মের প্রশ্ন আসে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, আমি অবশ্যই আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু এখানে যেহেতু খোদার অধিকারের প্রশ্ন তাই একথা মানা আমার জন্য কঠিন, এটি আমার সীমাবদ্ধতা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সবার জন্য আবশ্যক হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের কোন নির্দেশ অমান্য না করা। কিন্তু অনেক যুবক এমনও আছে যারা পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না আর তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়েও যত্নবান নয়। বরং সন্তান-সন্ততির মাঝে কেউ যদি কোন ভালো পদে নিযুক্ত হয় বা ভালো পদবী লাভ করে তাহলে সে নিজের দরিদ্র পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতেও লজ্জা বোধ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন, কোন এক হিন্দু বড় কষ্ট করে তার

ছেলেকে বিএ এবং এমএ পাশ করিয়েছে। আর সেই ডিগ্রি অর্জনের পর সে ডেপুটি নিযুক্ত হয় এবং দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যায়। সে যুগে ডেপুটি পদে নিযুক্ত হওয়া অনেক বড় সম্মানজনক বিষয় ছিল। যদিও আজকের যুগে এটিকে খুব একটা বড় পদ বলে গণ্য করা হয় না। একদিন তার পিতার মনে এই বাসনা জাগে যে, আমার ছেলে ডেপুটি নিযুক্ত হয়েছে, আমিও তার সাথে দেখা করে আসি। সেই হিন্দু যখন তার সন্তানের সাথে দেখা করার জন্য তার মজলিস বা বৈঠকে পৌঁছে সে সময় তার কাছে উকিল এবং ব্যারিস্টাররা উপবিষ্ট ছিল। তার পিতাও নিজের নোংরা ধূতি পরিহিত অবস্থায় এক কোনায় বসে পড়ে, কথাবার্তা চলতে থাকে। তার সেখানে বসা মজলিসের কোন একজনের পছন্দ হয়নি, সে জিজ্ঞেস করে, আমাদের এই বৈঠকে বা মজলিসে এই ব্যক্তি কে বসে আছে? ডেপুটি সাহেব তার কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হয় আর লজ্জা এড়ানোর জন্য বলে, এ ব্যক্তি আমাদের পরিচারক বা খাদ্য পরিবেশক। পুত্রের এই কথা শুনে পিতা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং নিজের চাদর গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, জনাব আমি তার ভৃত্য নই বরং তার মায়ের পরিচারক। পাশে উপবিষ্ট মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, ইনি ডেপুটি সাহেবের পিতা তখন তারা অনেক অভিযোগ-অনুযোগ করে যে যদি আমাদেরকে পূর্বেই জানিয়ে দিতেন তাহলে আমরা তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতাম, তাকে শ্রদ্ধার সাথে বসাতাম। যাহোক এ ধরনের দৃশ্যও চোখে পড়ে যে, আত্মীয়-স্বজন যদি দরিদ্র হয় তাহলে মানুষ তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে দ্বিধা প্রকাশ করে, তা তিনি পিতাই হোন বা অন্য যে-ই হোক না কেন, যেন কোথাও তাদের উচ্চ মর্যাদার হানি না ঘটে। এক কথায় পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, মানুষ তাদেরকে এড়িয়ে চলে। পিতা-মাতার নাম সমুজ্জ্বল করা তো দূরের কথা বরং তারা তাদের জন্য কলঙ্কের কারণ হয়।

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন, কতক আলেম বা বক্তাদের বক্তৃতা মানুষ সাময়িকভাবে উপভোগের মানসে শুনে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ সম্পর্কে বলেছেন, বৈঠকে কেবল এজন্য আসবে না যে, অমুক ব্যক্তি সুবক্তা তাই তার বক্তৃতা শুনবো বরং এটি দেখ, সেই বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে আর তা থেকে কীভাবে লাভবান হওয়া যায়। যাহোক কিছু মানুষ বক্তার কথার গভীরতাও অনুধাবন করে না আর তাদের বক্তৃতাও বুঝে না আর বক্তার কথার উদ্দেশ্য কী তাও বুঝতে পারে না বরং শুধু সাময়িকভাবে উপভোগের জন্য বসে থাকে। একইভাবে কতক বক্তাও সাময়িক আবেগ সৃষ্টির জন্য জোরালো বক্তৃতা করে বা করার চেষ্টা করে আর গলা থেকে বিভিন্ন প্রকার আওয়াজও বের করে এবং কৃত্রিমভাবে আবেগ সৃষ্টির বা মানুষের মন গলানোরও চেষ্টা করে। এমনই এক বক্তার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বক্তার কথা বলতেন। সেই ব্যক্তি বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হয়। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তুও ছিল বড় আবেগঘণ। এক ব্যক্তি সেখানে আসে এবং দাঁড়িয়ে পড়ে। সে কৃষক ছিল আর তার হাতে ছিল একটি 'তিরথড়ি'। তিরথড়ি ত্রিশাখাবিশিষ্ট ত্রিশূলসদৃস কৃষি যন্ত্রকে বলা হয় যার একটি

দীর্ঘ হাতলও থাকে আর এটি গম মাড়ার পর খড়ি ইত্যাদি একত্রিত কাজে ব্যবহার হয়। আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের পূর্বে পাশ্চাত্যেও এটি ব্যবহৃত হতো। যাহোক সে গ্রাম থেকে আসে এবং বক্তৃতা শোনার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে যত লোক বসে ছিল তাদের ওপর এই বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু সেই কৃষক কিছুক্ষণ পরই কাঁদা আরম্ভ করে। সেই বক্তার দুর্ভাগ্য, তার হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা দানা বাঁধে। সে ধরে নেয়, আমার বক্তৃতায় এই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছে। সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, দেখ! মানুষের হৃদয়ও বহু প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার হৃদয়ের অধিকারী হলে তোমরা যারা ঘন্টার পর ঘন্টা আমার বক্তৃতা শুনছো কিন্তু তোমাদের হৃদয় আদৌ এতে প্রভাবিত হয়নি আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র এই বান্দাকে দেখ! তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে বক্তৃতার প্রভাব পড়েছে। সে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এসে দন্ডায়মান হয় এবং কাঁদতে আরম্ভ করে। এরপর তার ওপর যে, কত গভীর প্রভাব পড়েছে তা মানুষের সামনে প্রকাশের জন্য সে সেই কৃষককে জিজ্ঞেস করে, মিঞাঁ! কোন কথাটি তোমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তুমি কেঁদে উঠলে? যারা পুরোনো কৃষক তারাই এটিকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে, সে বললো, গতকাল আমার বাছুরটি এভাবেই আওয়াজ করতে করতে মরে যায়, আপনার আওয়াজ শুনে আমার সেই বাছুরের কথা মনে পড়ে গেলো তাই আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। একথা শুনে সেই বক্তা খুবই লজ্জিত হয়। বস্তুতঃ সেই কৃষক আবেগ আপ্লুত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই বক্তার কয়েকবার চিৎকার করে কথা বলা আর কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম আবেগ প্রকাশ করার জন্য গলা থেকে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ বের করার কারণে তা হয়েছে। আর ফলে কৃষকের নিজ বাছুরের কথা মনে পড়ে যায় যার মৃত্যুর সময় গলা দিয়ে এমনই অদ্ভুত আওয়াজ বের হয়েছিল। সেই বক্তা সাহেবের নিজের বক্তৃতা সম্পর্কে ভুলধারণা জন্মে যে , হয়তো আমার বিগলিত চিত্তের বক্তৃতা শুনেই এই ব্যক্তি কেঁদে উঠেছে। কিন্তু তার লোকদেখানো ভাব এবং কৃত্রিমতা এই ধারণাকে তাৎক্ষণিকভাবে মিথ্যা প্রমাণ করে। আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মৌলভী বড় বড় বুলি আওড়ায় তাদের বক্তৃতা শুনলেও প্রায় সময় দেখবেন, তাদের গলা থেকেও অবিকল এমন আওয়াজই বের হয়। যাহোক এটি তাদের কাজ, বিশেষ ভাবে যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাদের মাঝে উম্মাদানা মাথা চাড়া দেয়, যারা পাকিস্তানে থাকেন বা যারা সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে এসেছেন তারা ভালো বুঝতে পারবেন আর যারা এমন বক্তৃতা শুনেছেন তারা জানেন যে, মৌলভীদের বক্তৃতা কেমন হয়ে থাকে।

আমাদের প্রতি খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য পেয়েছি নতুবা ইসলামের নামে পীর ফকিররা যেই ব্যবসা আরম্ভ করে রেখেছে আজকে আমরাও হয়তো সে সবেরই অংশ হতাম। এই পীর সাহেবরা দাবি করে যে, তারা অনেক উন্নত মার্গের মানুষ। তারা বলে, আমরা দোয়ার মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করি, আমাদের আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গভীর নৈকট্য রয়েছে, দুনিয়ার প্রতি আমরা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। কিন্তু এদের আমলের স্বরূপ কী? এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক ব্যক্তি

সম্পর্কে বলতেন, নিজের সম্পর্কে সেই ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, সে অনেক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত মানুষ। একবার এক মুরীদের ঘরে গিয়ে বলে, আমার ট্যাক্স নিয়ে আস অর্থাৎ আমাকে নযরানা দাও। দুর্ভিক্ষ ছিল, মুরীদ বলে, এখন কিছুই নেই, এবারের জন্য ক্ষমা করুন। কিন্তু পীর সাহেব দীর্ঘ সময় বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থেকে অবশেষে তার কোন জিনিস বিক্রি করিয়ে তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বিদায় হয়। এমন সব নোংরামি আর দুর্বলতা এদের মাঝে দেখা যায় অথচ বড় বড় দাবিও করে যে, আমরা অনেক উচ্চ মার্গের বুজুর্গ। এগুলো সে যুগের পুরণো কোন বিষয় নয় আজও পাকিস্তান বা এ ধরনের দেশে এমন পীর রয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রজ্ঞা এবং তত্ত্বজ্ঞানের যে বিবরণ রয়েছে তা জ্ঞানের সকল দিক এবং শাখাকে পরিবেষ্টন করে রখেছে। অবশ্য এটি ভিন্ন কথা যে, আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বা চিন্তা-ভাবনার অভাবে এর গভীরে অবগাহনের সামর্থ বা যোগ্যতা আমরা রাখি না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল নীতি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন শরীফে বিদ্যমান। তিনি বলেন, কুরআন সম্পর্কে আমি হয়তো সেভাবে প্রণিধানের সুযোগই পাইনি বা আমার তত্ত্বজ্ঞান হয়তো এখনও সেই মার্গে পৌঁছেনি কিন্তু যতটুকু তত্ত্বজ্ঞান আমার লব্ধ হয়েছে তার আলোকে আর জ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতাকে পূঁজি করে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, কুরআনের বাইরে আর কোন জিনিসের আমাদের প্রয়োজন নেই। অতএব কুরআনে অভিনিবেশ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেসব তফসীর লিখেছেন তাও পড়া উচিত। এছাড়া কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে খলীফাদেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা তফসীর রয়েছে তাও দেখা উচিত। সেই সাথে নিজেদেরও ভাবা উচিত আর কুরআন থেকেই জ্ঞান এবং তত্ত্ব-ভান্ডার উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত।

কেউ কেউ মনে করে, আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি আর তাই যথেষ্ট। অন্য কোন কিছুর আমাদের প্রয়োজন নেই। কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। কারো সাথে কোন পরামর্শ করার আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্মরণ রাখার বিষয় হলো, জ্ঞানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি শুধু বই-পুস্তক পড়ে ডাক্তার হতে চায় তাহলে এটি খুব কঠিন বিষয় বরং অসম্ভব বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ার পাশাপাশি যোগ্য ডাক্তারদের সামনে রোগীদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করাও আবশ্যক। যদি কেউ বই-পুস্তক পড়ে ডাক্তার হয় তার জন্য এরপর কোন বিশেষজ্ঞের সামনে রোগ নির্ণয় এবং রোগীর চিকিৎসা করাও আবশ্যক হয়ে থাকে। এ কারণেই কলেজে ডাক্তারদেরকে পড়ানোর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সামনে তাদের প্র্যাক্টিক্যালও হয়ে থাকে কেননা; তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও হওয়া চাই। যদি এমনটি না হয় তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না আর কিছুই শিখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এরপরও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে, শুধু পড়ালেখা চলাকালেই অভিজ্ঞতা অর্জন করলে হবে না বরং পরবর্তীতেও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়।

যাহোক কোন চিকিৎসক বা ডাক্তারের চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান তখনই পরিপক্ক হবে যদি সে নিয়মিত রোগী দেখতে থাকে। যদি তা না করে তাহলে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা কল্যাণকর হতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জ্ঞান এবং কর্ম সম্পর্কে বলতেন, একজন চিকিৎসক ছিল যে অনেক বড় জ্ঞানী ছিল। সে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভালো জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার পড়াশোনা ছিল অনেক ব্যাপক। রাজা রঞ্জিত সিংয়ের খ্যাতির কথা শুনে সে দিল্লী থেকে পদোন্নতির আশায় তার দরবারে পৌঁছে। রঞ্জিত সিংয়ের মন্ত্রী ছিল মুসলমান। সে এই চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে। সেই চিকিৎসক মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করে, মহারাজাকে সাক্ষাতের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ করা হোক। সে বলে, আমি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। মন্ত্রীর আশঙ্কা হয়, যদি এর প্রভাব বৃদ্ধি পায় তাহলে কোথাও আবার আমার নাপতন ঘটে। কিন্তু সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ না করাকেও সে সততা ও মানবতা পরিপন্থী বলে মনে করে। এছাড়া ডাক্তারের সাথে কথা বলে সে বুঝতে পেরেছিল, এর ব্যবহারিক কোন অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের দরবারে মুসলমান মন্ত্রী সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ করে এবং বলে, হুযূর! ইনি অনেক বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, অমুক অমুক কিতাব পড়েছেন। মন্ত্রী তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করে। মহারাজা রঞ্জিত সিং তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে বলো, ইনি চিকিৎসা করেছেন কিনা বা তার চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মন্ত্রী উত্তরে বলেন, হুযূরের কল্যাণে অভিজ্ঞতাও হয়ে যাবে, আপনার ওপরেই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। রঞ্জিত সিং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান অর্থহীন। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতার জন্য বেচারা রঞ্জিত সিংই রয়ে গেলো? তাই ডাক্তার সাহেবকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দেয়াই সমীচিন হবে।

অতএব জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও একান্ত আবশ্যক, আর পৃথিবীতে এর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। যে কোন কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের পর যদি প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা না হয় তাহলে অনেক এমন বাধা বিপত্তি সামনে আসে যখন কাজ করতে গিয়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে আর বুঝতে পারে না যে, এখন কি করব। মানুষ অচল হয়ে যায় আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যেই সমস্যা বা বাধা-বিপত্তি সামনে থাকে তা দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। অতএব কেবল জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যদি নিজেকে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা আরম্ভ করে তাহলে সে রঞ্জিত সিংয়ের উত্তরই পাবে। জামাতের সার্বিক উন্নতির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুবক শ্রেণীর আধুনিক জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করা উচিত আর অভিজ্ঞ লোকদের সাথে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জামাতের কল্যাণে সেটিকে ব্যবহার করা উচিত। অনেকেই এই পরামর্শ দেয় যে, নতুন প্রযুক্তি আছে এটি ব্যবহার করা উচিত বা এটি করতে হবে। অনেক সময় জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত তো ঠিক আছে কিন্তু কিছু বিষয় বা সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূরীভূত করা আবশ্যক হয়ে থাকে অথবা এমন সব প্রতিবন্ধকতাও সামনে আসতে পারে যা সম্পর্কে চিন্তা করা বা ভাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে আর অভিজ্ঞরা এটি খুব ভালো বুঝবে।

একজন আহমদী হিসেবে আমাদের ঈমানের হিফাযত তখনই সম্ভব যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে আমাদের দৃঢ় এবং অব্যাহত সম্পর্ক থাকে। আর এর জন্য সেসব মাধ্যমও কাজে লাগানো উচিত যার কল্যাণে দূরে বসেও এ সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। এক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামাতী বিষয়ে সদস্যরা কখনও উন্নতি করতে পারবে না বরং তারা জীবিতই থাকতে পারবে না যতক্ষণ মূলের সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকবে। আর এযুগে এই সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম উপায় হলো, পত্র-পত্রিকা। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন যদি জামাতের পত্র-পত্রিকা তার কাছে পৌঁছতে থাকে তাহলে এটি পাশে বসে থাকারই নামান্তর। এর দৃষ্টান্ত এমনই যেমন কিনা এখন আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। তিনি (রা.) বলেন, যেমন এখন মহিলাদের জলসা হচ্ছে আর মহিলারা লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধমে বক্তৃতা শুনছে। যদি মাইকের মাধ্যমে তাদের কাছে আওয়াজ না পৌঁছতো বা তাদের কর্ণগোচর না হতো তাহলে তারা কিছুই বুঝতে পারতো না যে, কি বলা হচ্ছে। অতএব লাউডস্পিকার বা মাইক মহিলাদেরকে আমার বক্তৃতার নিকটতর করেছে। এখানেও লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধ্যমে মহিলাদের হলে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আর তারা শুনতে পাচ্ছে, এটিও এক ধরনের নৈকট্য।

অনুরূপভাবে পত্র-পত্রিকা দূরে বসবাসকারীদের জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত রাখে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সবসময় বলতেন, আল্ হাকাম এবং বদর হলো আমাদের দু'টো বাহু। যদিও অনেক সময় এই পত্রিকাগুলো এমন সংবাদও ছেপে দিতো যা ক্ষতিকর হতো কিন্তু এর উপকারিতা যেহেতু ক্ষতি থেকে অধিক ছিল তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আমাদের এমন মনে হয় যেন এ দু'টো পত্রিকা আমাদের দু'টো বাহু। এখানে দু'টো বাহু হওয়ার অর্থ হলো, এর মাধ্যমে আমাদের যে বাহু রয়েছে অর্থাৎ জামাত তা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত বা সন্নিবেশিত রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বন্ধুদের জামাতের পত্র-পত্রিকার প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল অথচ তখনকার জামাত আজকের তুলনায় এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। আর আজকে তো শতভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ হবে। বদরের গ্রাহক সংখ্যা এক সময় চৌদ্দ থেকে পনের'শ এ পৌঁছে যায় কিন্তু এরপর তা কমতে থাকে। একইভাবে আল্ হাকামের গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। জামাতের বন্ধুরা সে যুগে পত্র-পত্রিকা অনেক বেশি ক্রয় করতেন। এমনকি যারা শিক্ষিত ছিল না তারাও পত্রিকা ক্রয় করে অন্যদেরকে পড়ার জন্য দিতো, আর মনে করতো, এটি তবলীগের একটি মাধ্যম। যেমন একজন আহমদী টমটম গাড়ি চালাতেন। তিনি খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি আল্ হাকাম আনিয়ে টমটম গাড়িতে বা ঘোড়ার গাড়িতে রেখে দিতেন। টমটম গাড়ীতে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় চেহারা দেখে বুঝতে পারতেন যে ইনি ভদ্র মানুষ। তখন তাকে পত্রিকা দিয়ে বলতেন, এই পত্রিকাটি এসেছে, আমাকে একটু পড়ে শোনান। আর এভাবে আরোহী বা প্যাসেঞ্জার নিজ গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামার পূর্বে পত্রিকার

নাম ঠিকানা নোট করে নিত আর এভাবে জামাতের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন হতো আর বয়আতও হতো। মানুষ বলতো, তিনি অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আর টমটম গাড়ীর চালক হয়েও নিজ এলাকায় সবচেয়ে বেশি বয়আত করিয়েছেন। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের তরবীয়ত এবং খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সব আহমদীর প্রধানতঃ এমটিএ শোনা আবশ্যক, এমটিএ শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। দ্বিতীয়তঃ তবলীগের জন্য এমটিএ এবং ওয়েবসাইটের যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে তাও বন্ধুদের জানানো উচিত। অনেক সময় বন্ধুদের সাথে বসে সেগুলো দেখার সুযোগ হয়। বন্ধু-বান্ধবদের এ সম্পর্কে বলা উচিত বা পরিচিত করানো উচিত। আমার কাছে এখনও এমন অনেক পত্র আসে যাতে মানুষ লিখে, যখন থেকে এমটিএ'তে অন্ততঃপক্ষে রীতিমত খুতবা শুনতে আরম্ভ করেছি তখন থেকে জামাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছে এবং আমাদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করছে। অতএব আজকাল এমটিএ এবং অনুরূপভাবে জামাতি যে ওয়েবসাইট রয়েছে, 'আল্ ইসলাম' এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম আর সব আহমদীর তরবীয়ত এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম। অতএব সব আহমদীর উচিত এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা।

অনেকেই আত্মসংশোধন বাসনা রাখে, আর ইসলামী আদেশ-নিষেধ মেনে চলার আগ্রহ রাখে, বিশেষ করে চায় যেন রীতিমত নামায পড়ার সুযোগ যেন হয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা এমন মানুষের সাহচর্যে এসে যায় যারা অলস, এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরাও নামাযের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আলস্যের শিকার হয় আর অবচেতন মনেই এমনটি ঘটতে থাকে। অতএব বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের জন্য এমন মানুষ খুঁজে বের করা উচিত, যাদের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত। যারা রীতিমত নামায পড়ে বা নামাযে অভ্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেখানে একটি ছোট জায়গায় আহমদীদের অনেক ঘন বসতি রয়েছে। এছাড়া সেখানকার মসজিদগুলোর একটি থেকে অন্যটি স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। তাই তাদের মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা উচিত। অনুরূপভাবে অনেকেই এমন আছে যারা জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী রাখে, তাদেরকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। অনেক সময় মানুষ যখন বাহির থেকে সেখানে যায় তারা এ সম্পর্কে আমাকেও লিখে আর অভিযোগও করে যে, রাবওয়ার লোকদেরও যথাযথভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। অতএব রাবওয়ার নাগরিকদের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। যারা দুর্বল রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে জামাতের সাথে যাদের সম্পর্ক দৃঢ় এবং যারা রীতিমত নামাযও পড়ে তাদের প্রভাব গ্রহণ করা উচিত। বন্ধু-বান্ধব মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে আর বুদ্ধিমান কীভাবে বুঝতে পারে যে, আমার ওপর অন্যের প্রভাব পড়ছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার জালিনুস বা গ্যালেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন এক উন্মাদ ব্যক্তি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে।

যখন সে জালীনুসকে ছাড়ে তখন তিনি বলেন, আমার রক্তমক্ষণ কর অর্থাৎ রগ ছিদ্র করে তা থেকে রক্ত বের কর। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি রক্তমক্ষণ কেন করাতে চান? তিনি বলেন, এই উন্মাদ যে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে তা থেকে বোধ করি আমার ভেতরও উন্মাদনার কোন ব্যাধি রয়েছে কেননা; সে অন্যদের বাদ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার মাঝেও উন্মাদনার কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সাথে এই উন্মাদ নিজের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছে যে কারণে সে আমার দিকে ছুটে এসেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন লোকদের পিছনে চলা যারা নামাযী নয় আর তাদের পেছনে চলা যারা নামাযে অলস, এটি স্পষ্ট করে যে, অলসদের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য রয়েছে।

অতএব মোটের ওপর আহমদীদের অলসদের সাথে যোগাযোগ রাখার পরিবর্তে জামাতের মাঝে যারা সক্রিয়, কর্মঠ এবং আন্তরিক তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত বা তাদর সাথে মিল বা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা উচিত। আর এই সামঞ্জস্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মশক্তিতে বলিয়ান লোকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে যারা অলস আছে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে এক ব্যক্তি আসে এবং বলে, আমি নিদর্শন দেখতে চাই, যদি আমাকে অমুক নিদর্শন দেখানো হয় তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে তাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কোন ভেলকিবাজ নন, তিনি কোন তামাশা দেখান না বরং তাঁর প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি আমাকে বলুন, পূর্বে যেসব নির্দশন দেখানো হয়েছে সেগুলোকে আপনি কতটা কাজে লাগিয়েছেন যে, এখন আপনার জন্য আবার নতুন নিদর্শন দেখাতে হবে। কিন্তু মানব প্রকৃতির দুর্বলতা একে অপছন্দ করে বরং এটিকে সে সভ্যতা বিবর্জিত আচরণ মনে করে। সে মনে করে, আলস্য এবং উদাসীনতায় নিপতিত থাকা বৈধ বরং সে স্থায়ীভাবে এই অবস্থায়ই নিপতিত থাকতে চায়। সে এটি চায় না যে, কেউ তাকে এই প্রশ্ন করুক যে, সে নিজের দায়িত্ব কতটা পালন করেছে? কিন্তু তার দাবি হলো সে যখন কোন তামাশা দেখতে চায় তখন তাকে যেন তা দেখানো হয়। কাজেই এই হলো মানব প্রকৃতি। নাছোড় বা হঠকারীদের এমন আচরণ চিরাচরিতভাবেই চলে । না মানার হলে তারা শয়তানের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। সব নবীকে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, এমনকি মহানবী (সা.)-কেও। অস্বীকারকারীরা তাঁর কাছে এরূপ দাবি-দাওয়াই পেশ করেছে। যেমন স্বর্ণের ঘরের মু'জিযা দেখান, আকাশে আরোহণের নিদর্শন দেখান, শুধু তাই নয় বরং আকাশ থেকে আমাদের সামনে কোন গ্রন্থ নিয়ে আসুন, আর এভাবে আরো আজেবাজে প্রশ্ন করতে থাকে। অতএব খোদা তা'লা এমন অহেতুক দাবি-দাওয়াকে কোন গুরুত্বই দেন না আর তাঁর নবীরাও এগুলোকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেন না। অগণিত নিদর্শন রয়েছে, মানতে হলে একজন নেক প্রকৃতির মানুষের জন্য তাই যথেষ্ট।

কতিপয় ব্যক্তি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে কিছু আপত্তি করে যে, এটি আবার কোন্ নতুন স্কীম চালু করা হলো। এর উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, সত্যিকার অর্থে আমার এই তাহরীকে জাদীদের তাহরীক নতুন কোন তাহরীক নয় বরং এটি একটি প্রাচীন তাহরীক। আর জাদীদ বা আধুনিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেসব পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং রোগাক্রান্ত মস্তিষ্কের মোকাবিলা করা হয়েছে যারা জাদীদ বা আধুনিক ছাড়া অন্য কোন কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। যেভাবে ডাক্তার যদি দীর্ঘদিন কোন রোগীর চিকিৎসা করতে থাকে, রোগী অনেক সময় বলে বসে, এই ঔষধে আমার কোন কাজ হয় না। তখন ডাক্তার বলেন, আজ আমি তোমাকে নতুন ঔষধ দিচ্ছি। এটি বলে পূর্বের ঔষধে অন্য কিছু মিশিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি (রা.) সে যুগের কথা বলেন যখন টিংচার কার্ডিমাম মিশিয়ে কিছু ঔষধকে সুগন্ধিযুক্ত করে তোলা হতো, আর রোগী মনে করতো, আমাকে নতুন ঔষধ দেয়া হয়েছে। আর ডাক্তারও নতুন ঔষধ শব্দটি ব্যবহারের অধিকার রাখত কেননা; সে ঔষধের সাথে আরেকটি ঔষধ মিশিয়ে এমনটি করতো। কিন্তু এটিকে সে নতুন বানায় এজন্য যাতে রোগী তা পান করা অব্যাহত রাখে এবং সে যেন নিরাশ না হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একজন বৃদ্ধা আসেন, তার দীর্ঘদিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, কোনভাবেই সেই জ্বর নামছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তুমি কুইনিন খাও। সেই মহিলা বলে, কুইনিন? আমি তো কুইনিন ট্যাবলেটের এক চতুর্থাংশ খেলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ জ্বরে ভুগতে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দেখলেন, এই মহিলা কুইনিন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় তখন তিনি তাকে খাওয়ার জন্য কুইনিনই দেন কিন্তু বলেন, এটি দ্বারাইন এর ট্যাবলেট, এটি খাও। আমাদের দেশে যেহেতু সচরাচর কুইনিনকে কোনাইন বলে আর কোনাইন শব্দের অর্থ হলো, দু'জগৎ বা দ্বারাইন অর্থাৎ ইহ এবং পর জগৎ। কোনাইন এবং দ্বারাইন উভয় শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ দু'জগৎ। এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা বলেননি যে, এটি কুইনিন নয় বরং তিনি শুধু এর নতুন নাম রেখেছেন। সেই মহিলা হয়তো দু'তিনটি ট্যাবলেটই খেয়ে থাকবে আর এসে বলে, এই ঔষধে আমার জ্বর নেমে গেছে। আমাকে আরো কিছু ট্যাবলেট দিন। পূর্বে বলতো, অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ট্যাবলেটও যদি খাই শরীর গরম হয়ে যায় জ্বর নামে না। অথচ এখন নাম পরিবর্তন করে দিতেই শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে অর্থাৎ সব জ্বর উধাও হয়ে গেছে। তিনি (রা.) বলেন, আমিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মত পুরনো এক তাহরীকের নাম তাহরীকে জাদীদ রেখেছি আর তোমরা বলছো, জাদীদ কেন রাখা হল বা নতুন করে তাহরীকের প্রয়োজন কি? আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি যাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা নতুন তাহরীকের কথা শুনে বলে, আস এটি একটি নতুন তাহরীক, চল আমরা এথেকে উপকৃত হই। কিন্তু যাদের মাঝে কপটতা ও মুনাফিকাত ছিল তারা একে নুতন জিনিষ মনে করে বলতে আরম্ভ করে, ইনি এখন নতুন নতুন কথা আবিষ্কার করছেন আর মুহাম্মদ (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। এরা কথা বুঝার চেষ্টা করেনি আর লাভবানও হয়নি। অতএব এটি এক রীতি যা সব সময়

বা আদি থেকে অর্থাৎ আদমের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। অর্থাৎ শয়তান যখন তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তখন শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোমাকে পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। শয়তানকে এড়িয়ে ধর্মের কাজে উন্নতির জন্য যখনই কোন পন্থা বের করা হয় তা আসলে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে যেই উদ্দেশ্যে নবীরা এসেছেন আর যে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) এসেছেন আর যার জন্য এ যুগে তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন।

যেকোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর জামাতের সামগ্রিক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে যেতে হয় তা তরবীয়তের কাজ হোক বা অন্য যেকোন কাজই হোক না কেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক ফকির ছিল যে প্রায় সময় সেই কক্ষের সামনে বসে থাকতো যেখানে পূর্বে হিসাবরক্ষকের অফিস ছিল। আহমদীয়া চক থেকে কোন ব্যক্তিকে আসতে দেখলেই সে বলতো, এক রুপি দাও। সেই ব্যক্তি কিছুটা এগিয়ে আসলে সে বলতো, আট আনা দাও। এরপর আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সে বলতো, আচ্ছা চার আনা দাও বা সিকি দাও। এরপর তার সামনে এসে গেলে বলতো, দুই আনাই দাও। এরপর তাকে অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো, এক আনা দিলেও চলবে। আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো, অন্ততঃপক্ষে এক পয়সাই দাও। আরো কিছুদূর গেলে বলতো, আধা পয়সাই দাও। সেই ব্যক্তি মসজিদে আক্বসার মোড়ে পৌছে গেলে বলতো একটি পাকোড়াই দিয়ে দাও। এরপর সে যখন দেখতো, গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে তখন বলতো, নিদেনপক্ষে একটা মরিচই দাও। সে রুপি থেকে আরম্ভ করে মরিচে এসে শেষ করত। অনুরূপভাবে যারা কাজ করে বা যারা কর্মী তাদেরও একথা ভাবা উচিত যে, অন্যূন কিছু তো হস্তগত হওয়া চাই।প্রথমে শ' এর ভেতর যদি একজন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে পরের বার দু'জন হয়ে যাবে, এর পরের বার চার হবে আর এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অতএব কাজ কর এরপর ফলাফল দেখ। জাগতিক কাজকর্ম যেখানে ফলাফল শূন্য হয় না সেখানে এটি কীভাবে ভাবা যেতে পারে যে, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কাজ ফলাফল শূন্য থেকে যাবে? কিন্তু যাদের হৃদয় পরিষ্কার হয় না তারা বলে, আমরা কাজ করি কিন্তু ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে। ফলাফল অবশ্যই আল্লাহ্‌র হাতে মর্মে তাদের কথার অর্থ হলো, আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পুরো পরিশ্রম করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি শত্রুতা করেছেন। একথা বলা কত বড় নির্বুদ্ধিতা। এটি নিজেদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য খোদা তা'লাকে দায়ী করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার নিয়ম হলো, আমরা যে কাজ করি সেই কাজের কোন না কোন ফলাফল অবশ্যই প্রকাশ পায়। কিন্তু ফলাফল ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে আমাদের নিজেদের কাজের ওপর। কোন ব্যক্তি এক দশমাংশ পরিশ্রম করলে প্রকৃতির আইন হলো, তার ফলাফলও এক দশমাংশই প্রকাশ পাবে। এখানে দশমাংশের অর্থ এটি নয় পরিশ্রম তো সে বেশি করেছিল কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের কারণে এমনটি হয়েছে! প্রকৃতির নিয়ম কারো পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেয় না কিন্তু

দুস্কৃতকারী ব্যক্তি বলে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন নি আর ভুলে গেছেন! এর চেয়ে বড় কুফরী বাক্য আর কি হতে পারে? অতএব শ্রম ও সাধনার যতটুকু সম্পর্ক আছে ফলাফল আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে। যদি ফলাফল ভালো না হয় তাহলে নিশ্চিত হতে পার যে, আমাদের কাজে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। চেষ্টা করা উচিত যেন সব কাজের ফলাফল সুনির্দিষ্ট রূপে আমাদের সামনে প্রকাশ পায়। ফলাফল যতদিন প্রকাশ না পায় ততদিন আমাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

কতিপয় মানুষ লিখে, আমরা অনেক ইবাদত করেছি, অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয়নি, দোয়া গৃহীত হয়নি। তাদেরও একথা বুঝতে হবে যে, যতটা যাওয়া উচিত ছিল তারা হয়তো সেখানে পৌঁছেনি বা গন্তব্য নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তারা ভুল রাস্তা বেছে নিয়েছে। একজন দোয়াকারী ব্যক্তির এটি নিয়ে ভাবা উচিত যে, রাস্তাও যেন সঠিক হয় আর যতটা পরিশ্রম করা প্রয়োজন তাও যেন করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একজন অপরসায়নবিদ যখন ব্যর্থ হয় তখন সে বলে, এক লাইন বা এক বিন্দুর ঘাটতি রয়ে গেছে অর্থাৎ মহামূল্য ধাতু বানাতে পারার বিষয়ে সে নিরাশ হয় না বরং নিজের দুর্বলতার কথাই স্বীকার করে অথচ এক্ষেত্রে সাফল্য লাভের কোন আশা দূরাশা মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে তো সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের পুরো আশা থাকে। একজন আলকেমিস্ট বা অপরসায়নবিদ যার সারাটি জীবন সামান্য ঘাটতি বা ভুল-ত্রুটির সংশোধনের চেষ্টায় কেটে যায়, সে কখনও সফলতার বিষয়ে নিরাশ হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্য চায় আর সফলতা পায় না সে এর জন্য নিজের কর্মপন্থার ত্রুটিকে দায়ী করে না বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিরাশ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। অতএব এক অপরসায়নবিদ ভুল-ত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, স্বর্ণ বানাতে অবশ্যই সক্ষম হবে কিন্তু যে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা করে সে নিজের ভুল-ভ্রান্তিকে খোদার প্রতি আরোপ করে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দেয়।

অধুনা গবেষকদের অবস্থাও একই, বছরের পর বছর একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য গবেষণা করে, বছরের পর বছর তাতে ব্যয় করে এবং বহু বছর পর তাতে সাফল্য আসে। আর তাতেও যে রীতি তারা একবার অবলম্বন করে সর্বদা সেই রীতিই অবলম্বন করা আবশ্যক নয়, বিভিন্ন গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করা হয়। অতএব আধ্যাত্মিকতা অর্জন এবং খোদার নৈকট্য লাভ আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য নিজের রীতি এবং পন্থা দেখতে হবে। আত্মসংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কীভাবে আত্মসংশোধন করা হচ্ছে। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে। নিজের ইবাদতের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। খোদা তা'লার সকল আদেশ নিষেধ অনুসারে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। নিজের প্রতিটি কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমাদের কর্মের মান কেমন? নিজেদের চিন্তাধারা এবং যুক্তি-বুদ্ধির সংশোধনের প্রয়োজন

রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলেন, আমি বান্দার কাছে অবস্থান করি এবং তাদের দোয়া গ্রহণ করি, তারপরও যদি তিনি কাছে না আসেন আর দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে কোন না কোন ক্ষেত্রে বা কোন স্থানে অবশ্যই আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি আছে এবং ব্যবহারিক অবস্থায় কোন দুর্বলতা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, ফকির বা ভিক্ষুক দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ফকির হলো 'নরগাদা' আর দ্বিতীয় প্রকার ফকির হলো 'খরগাদা'। 'নরগাদা' ফকির হলো সে যে কারো দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে যে, কিছু দাও। তখন কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করে আর না দিলে দু'তিন বার ডেকে চলে যায়। কিন্তু 'খরগাদা' ফকির সে যে যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সেখান থেকে সরে নড়ে না। এমন ফকির কিছু না নেয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না, কিন্তু এমন ফকির খুব কমই হয়ে থাকে। আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বসে থাকত। সে ততক্ষণ উঠতো না যতক্ষণ কিছু হস্তগত না করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যতক্ষণ বাইরে এসে তাকে কিছু না দিতেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকত। অনেক সময় সে পয়সা নির্ধারণ করে বলতো, এত টাকা নিব। যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেয়ে কম দিতেন সে নিত না। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে, অতিথিরা তার উদ্দিষ্ট অংক তাকে দিয়ে দিত যেন সে চলে যায়। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি তার মুখ থেকে যদি এমন কোন কথা বের হতো যে এত টাকা নিব তাহলে যতক্ষণ সেটি পুরো না হত সে নড়তো না। হুযূর (আ.) অসুস্থ থাকলে সে ততক্ষণ যেত না যতক্ষণ হুযূর সুস্থ হয়ে বাইরে না আসতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, মানুষের 'খারগাদা' হওয়া অর্থাৎ খর-ফকির হওয়া আর চাওয়া অব্যহত রাখা। আল্লাহ্‌র দরবারে ধরনা দিয়ে বসে থাকা আর বিচ্যুত না হওয়া যতক্ষণ খোদার কর্ম এটি প্রমাণ না করে যে, এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয়। এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয় মর্মে আল্লাহ্ তা'লার কর্ম কয়েকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক মহিলা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকে, আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এটি বোঝা যায় যে মেয়ে হতে যাচ্ছে নাকি ছেলে । আর শেষ সময় এসে এটি পরিষ্কারভাবে বুঝায় যায়, ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। তখন একথা বলা যে, ছেলেই হোক, এটি খোদার কর্মের পরিপন্থী আচরণ, এটিতো জন্মের একান্ত পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ গর্ভকালের একেবারে শেষ সময়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যেন পরবর্তী গর্ভধারণে ছেলে সন্তান দান করেন এই মর্মে দোয়া গৃহীত হতে পারে। অথবা কখনও যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর এরপরও মানুষের পক্ষ থেকে বিপরীত দোয়া করতে থাকা ভ্রান্ত রীতি, এটি শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। কিন্তু এখানে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কখনো তদবীর বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। অবিচলতার সাথে চেষ্টা এবং দোয়া করে যাওয়া খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে, তাই চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে দোয়া একান্ত আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, দোয়ার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি। **এমন ব্যক্তির দোয়া তার মুখে ছুড়ে**

মারা হয় যে কেবল দোয়া করে কিন্তু কোন চেষ্টা করে না। যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়াকে এক সাথে না রাখে তার দোয়া গৃহীত হয় না, কেননা দোয়ার সাথে চেষ্টা না করা খোদার আইন লঙ্ঘন করা এবং তাঁর পরীক্ষা নেয়ার নামান্তর। বান্দা আল্লাহ্‌র পরীক্ষা নিবে এটি খোদার মহিমা পরিপন্থী একটি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবিচলতার সাথে এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করে সকল বাহ্যিক উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি একজন শহীদের জানাযা। তিনি হলেন মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব, পিতার নাম জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, তিনি শেখুপুরা জেলার কোট আব্দুল মালেক-এর অধিবাসী। গত ১লা মার্চ ২০১৬ তারিখে দুপুর প্রায় দেড়টার দিকে তাঁর ঘরের বাইরে ছুরিকাঘাত করে বিরোধিরা তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার দিন শহীদ মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব ঘরের সাথে সন্নিবেশিত দোকান বন্ধ করে বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে আনার জন্য ঘর থেকে বের হতেই, দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার ওপর হামলা করে এবং তাকে টেনে-হিচড়ে গলিতে নিয়ে যায়। এক ব্যক্তি কামরুয্ যিয়া সাহেবকে চেপে ধরে আর দ্বিতীয় জন উপর্যুপুরি ছুরিকাঘাত করতে আরম্ভ করে। কামরুয্ যিয়া সাহেব আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন কিন্তু তার বুক, কাঁধ, হৃৎপিণ্ড এবং ঘাড়ে আঘাত আসে, একজন আক্রমণকারী পিছন থেকে ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করে আর ছুরি সেই অবস্থায় রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তার বড় দাদা জনাব দৌলত খান সাহেবের মাধ্যমে আসে যিনি গুরুদাসপুর জেলার অলক বেরী থেকে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর রাবওয়ার বেহেশতী মক্বেরায় তিনি সমাহিত হন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব ফাতেহ মোহাম্মদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জন্মগত আহমদী ছিলেন, তিনিও রাবওয়ার বেহেশতী মক্বেরায় সমাহিত রয়েছেন। দেশ বিভাগের পর এই পরিবারটি হিজরত করে শিয়ালকোটের কালী ক্যানাগরেতে বসতি স্থাপন করে। শহীদ মরহুম সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৫ সনে কোট আব্দুল মালেকে স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুম বিকম পর্যন্ত পড়ালিখা করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন চাকুরী করেন, তারপর ঘরের সাথে একটি দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন আর ফটোস্ট্যাট এবং মোবাইল ফোনের দোকান দেন। ২০০৪ সনে তিনি বিয়ে করেন। বহু গুণের আধার ছিলেন, নেক, ঈমানদার, উত্তম চরিত্র, পবিত্র স্বভাব, মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ এবং সৎসাহসী যুবক ছিলেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। জামাতের কাজেও সবসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পলন করেছেন, সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। শহীদের ভাই মাযহার আলী সাহেব বলেন, মোটের ওপর নামায, বিশেষ করে

জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন। রীতিমত তাকে জুমুআ পড়তে দেখে অন্যান্য অ-আহমদী দোকানদারও জুমুআর দিন তাদের দোকান বন্ধ করে জুমুআর জন্য যেতো এবং বলতো, যদি এক মির্যায়ী জুমুআর সময় দোকান বন্ধ করে যেতে পারে তাহলে আমাদেরও যাওয়া উচিত। এ কারণেও তিনি কোন সময় জুমুআর নামায পরিত্যাগ করতেন না যে, আমার কারণে অ-আহমদীরাও জুমুআ পড়তে যায়।

তার স্ত্রী বলেন, গত মাস থেকে শহীদ মরহুমের আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, আর পূর্বের চেয়ে অধিক আমার যত্ন নিতে আরম্ভ করেন, কোন রূঢ় কথায়ও রাগ করতেন না। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন আর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদের পদে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জামাতী পদে তিনি কাজ করেছেন এবং জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। সকল জামাতী কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তিনি জামাতের কারণে অনেক দিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। এ সম্পর্কে পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদনও করা হয়েছে। ২০১২ সনের ১৪ই আগষ্ট প্রায় পাঁচশ' মানুষের একটি মিছিল পুলিশের নেতৃত্বে কামরুয্ যিয়া সাহেবের ঘরের বাহিরে সমবেত হয়, বিরোধীদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করে একজন পুলিশ তার দোকানের কাউন্টারে উঠে ছবি নামাতে আরম্ভ করে আর দোকানের সাটারে লেখা **'ওয়াল্লাহু খায়রুর্ রাযেকীন'** এবং কলেমা তাইয়্যেবার ওপর আলকাতরা লেপন করে। পরে দোকানের দেয়ালে ঝুলন্ত **'আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহ্'** এবং **'মাশাআল্লাহ্'**র বোর্ড হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঘরের বাইরের নেইমপ্লেট থেকে, যেখানে কামরুয্ যিয়া সাহেবের পিতার নাম মোহাম্মদ আলী লেখা ছিল, মোহাম্মদ অংশটি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এই হল এদের অবস্থা। এটি দেখে ইন্না লিল্লাহ্ পড়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

একইভাবে ২০১৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী ৪০/৫০ জন মৌলভীর একটি মিছিল কামরুয্ যিয়া সাহেবকে জোর করে দোকান থেকে বের করে সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত করা ছাড়াও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবির অবমাননা এবং অসম্মান করে আর নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে থাকে, তখন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কামরুয্ যিয়া সাহেবকে থানায় নিয়ে যায় কিন্তু পরে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়েই বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়। এই হলো বিরোধির চিত্র এবং অবস্থা। তাকে সব সময়ই হুমকি দেয়া হতো, আর এ কারণে তার বহিঃর্বিশ্বে চলে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন।

শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'ভাই এবং দু'বোন, পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, স্ত্রী রুবী কুমর সাহেবা ছাড়াও তিনজন সন্তান হুযায়ফা আহমদ, আমাতুল মতিন এবং আরেক কন্যা আমাতুল হাদী রেখে গেছেন যাদের বয়স যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৪ বছর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই শহীদ ভাইয়ের মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে তার মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করা

অব্যাহত রাখুন এবং জান্নাতের নিয়ামতে তাদেরকে ভূষিত করুন আর তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে স্থান দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত